উত্তর আমেরিকার
নির্বাচিত বাংলা গল্প

সম্পাদনা

পলি শাহীনা

উত্তর আমেরিকার নির্বাচিত বাংলা গল্প
সম্পাদনা : পলি শাহীনা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Uttar Americar Nirbachita Bangla Golpa edited by Poly Shahina Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: June 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97730-1-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

কবি কথাসাহিত্যিক প্রাবন্ধিক ইকবাল হাসানের স্মৃতির প্রতি

সম্পাদকের কথা

প্রবাসে অবস্থানকালীন বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা খুব একটা সহজ কাজ নয়। জীবনের তাগিদে ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার সঙ্গে ঘুরতে থাকা প্রবাসীদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। এমন ভারযুক্ত পরিবেশে সৃজনশীল মানুষ আনন্দ খুঁজে নেয় সৃজনশীলতার ভেতরে। এই বইয়ে অন্তর্গত গল্পগুলো পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে লক্ষ করেছি গল্পকারদের বিচিত্র বিষয়বস্তু, গল্পশৈলী, গঠন যা এক বিশালতার স্বরূপ হিসেবে ফুটে উঠেছে। গল্পের চরিত্রগুলো যেন চলচ্চিত্রের মতো চোখের সামনে হাঁটছে। আমি উপলব্ধি করছি, এই গল্প সংকলনটি পাঠ শেষে পাঠক মনের আগল খুলে কিছু সময়ের জন্য বিস্ময়কর এক অন্য ভুবনে ডুবে যাবে, এবং চিন্তার পাশাপাশি আবেগের অন্বেষণ করবে। সব মিলিয়ে আশা করছি এই গল্প সংকলনের গল্পের চরিত্রদের সঙ্গে পাঠকের একটি আনন্দময় ভ্রমণ হবে। তবু সাফল্য, ব্যর্থতা নিরূপণের ভার পাঠকেরই।

এই সংকলনে মাত্র ২৮ জন গল্পকারের নির্বাচিত গল্প গ্রন্থিত হয়েছে। এর বাইরেও আরও অনেক গল্পকার আছেন উত্তর আমেরিকায়। তাঁদের সবার লেখা নেয়া সম্ভব হয়নি এ সংকলনে। আগামীতে তাঁদের নির্বাচিত গল্প গ্রন্থিত হবে হয়তো।

এই সংকলনটি প্রকাশের মুখ্য উদ্যোক্তা কবি প্রকাশনীর কর্ণধার সজল আহমেদের। বেশ কয়েকজন লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

পলি শাহীনা
৫/১৭/২০২৩
নিউইয়র্ক

ভূমিকথা

উত্তর আমেরিকার বাংলা গল্পের এই সংকলনের সবই বাংলাদেশের গল্প। মানে বাংলাদেশের বাঙালি লেখকের গল্প। আমি ব্যক্তিগতভাবে উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিমে গিয়ে যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাঁরা সকলেই বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালি। এবং তাঁরা ভাষা-সংস্কৃতির চর্চা করেন। বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষা চর্চায় নিরন্তর সক্রিয় থাকেন। শুধু বাংলা ভাষা বলব কেন, বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে পরবাসে বেঁচে থাকতে চান। এবং এই চাওয়ার কোনো তুলনা হয় না। দেশ এবং ভাষার প্রতি তাঁদের আবেগ, তাঁদের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাঁরা নিউইয়র্কে যে বাংলা বইয়ের মেলা করেন, সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। দেখেছি বিপুল জনসমাগম এবং বাংলা বই নিয়ে আগ্রহ। তাঁরা পরবাসজীবনে ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন যেভাবে, ভারতীয়রা তেমন রাখতে পেরেছেন কি না জানি না। আসলে ভাষা আন্দোলন, তার আগে পাকিস্তান আমলের নিপীড়ন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—সব যে জাতিকে নির্মাণ করেছে, সে জাতির রূপ এমনই হয়। আর ভারত তো নানা ভাষায় রঞ্জিত, সেখানে ঠিক এমনটি হতে পারে না।

এই সংকলনের ২৮ জন লেখক আমেরিকায় থাকেন। কত হাজার মাইল দূরে তার হিসেব করতে যাচ্ছি না। কিন্তু পশ্চিম গোলার্ধে। আমেরিকায় বাস করা এবং বাংলাদেশে বাস করা এক নয়। সবই আলাদা। ভূপ্রকৃতি থেকে সমাজ। সেখানে গেছেন তাঁরা জীবিকার কারণে। দেশ বহুদূরে, মা বাবা ভাই বোন, গ্রাম নদী, বাঁশবন, হাটবাজার সব হারিয়ে তাঁরা যেখানে পৌঁছেছেন, সেখানে বসে অবসরে যখন লিখতে বসেন, নিজের গ্রামটিতে, শহরে ফিরে যান। এত বছর আমেরিকায় থেকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি কেউ যে তা তাঁদের গল্পে চেনা যায়। অধিকাংশ গল্পেই বাংলাদেশ। নদী নালার বাংলাদেশ, ফল-পাকুড়ের বাংলাদেশ। কী মায়া সেই সব লেখার ভিতরে। ফেলে আসা দেশ, সমাজ, উঠে এসেছে প্রায় প্রতিটি লেখায়। অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, আনিসুজ জামান, আবু সাঈদ রতন, আলি সিদ্দিকী যাঁর গল্পই পড়ি সেই

নিজের দেশ। মেলা হাট বাজার, মুক্তিযুদ্ধ, জনাকীর্ণ ঢাকা শহরের প্লাবিত রূপ, একটা দেশ উঠে আসছে তার সমাজ আর বেঁচে থাকার রীতিনীতি নিয়ে। অনুবাদক আনিসুজ জামান যে গল্পটি লিখেছেন তা প্রেমের। গল্পটি চিরায়ত জীবনবোধের।

জীবনের পরম্পরায় জীবন সুন্দর। গল্পটির নাম ভালোবাসা কারে কয়। আলি সিদ্দিকীর গল্প দৃষ্টিলাভ অপরাহ্নবেলায় প্রবল বৃষ্টিতে প্লাবিত ঢাকা শহর। তাঁর দেখার চোখ চমৎকার। কবে তিনি ছেড়ে এসেছেন দেশ, কিছুই ভোলেননি। তাঁর কলমে জোর আছে মনে হয়। এই যাঁদের কথা বললাম তাঁদের গল্প আমি আগে পড়িনি। আনিসুজ জামানের অনুবাদ পড়েছি, গল্প এই প্রথম। এই সংকলনে পরিচিত লেখক বলতে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, দীপেন ভট্টাচার্য, কুলদা রায়, স্মৃতি ভদ্র, লুতফুন নাহার লতা, স্বপন বিশ্বাস, নাহার তৃণা, কাজী রহমান, এমনই কজন আছেন। কুলদা রায়ের সেরা গল্পের একটি এই সংকলন রয়েছে। 'দুটি হলুদ ইলিশের গল্প' এত মায়াময়, এত ক্ষুধার গল্প, না খেয়ে বাঁচার গল্প, আবার অপেক্ষার গল্প যে ভুলতে পারি না। গোটা বাংলাদেশ যেন উঠে এসেছে এই গল্পের ভিতর। দীপেন ভট্টাচার্য কল্পবিজ্ঞান লেখেন। উভয় বাংলায় তাঁর তুল্য এমন চমৎকার কল্পবিজ্ঞান আমি পড়িনি। এই সংকলনের গল্পটি আরম্ভ হয় স্বাভাবিক এক গল্পের আধারে। কিন্তু গল্প যেখানে পৌঁছয় সেখানে সময় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত। নিজের পাশে নিজে বসে থাকা, এই সময় পেরিয়ে সেই সময়ে গল্প শুরু করে এই সময়ে তাঁর ফিরে আসা। গল্পটি চমকে দেয়। এই গল্পে দেশ আছে আবার পরবাস আছে। জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত আগে পড়েছি অনেক। পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। এই সংকলনভুক্ত গল্প 'দেহাবশেষ' বাংলাদেশের পটভূমিকায় লেখা। তিনি বাস্তবতার কিনারায় হেঁটেছেন কাহিনি নির্মাণে। প্লাবনের পর যে দেহাবশেষ পাওয়া গেল সে তার নিজের আত্মজন কি না সেই সংশয় মেটাতে ডাক্তার, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটবর্তী হয়। তারা এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকারী যা সে মনে করে, তা নয়। এই সংশয় নিয়েই গল্প। গল্পটি ভাবায়। পাঠক নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কি না, পাঠক বুঝবেন। পূরবী বসুর গল্প লিঙ্গ পরিবর্তন নিয়ে। লেখক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করেছেন এই সংকলনে। প্রত্যেকেই আলাদা। পূরবী বসুর গল্প-ভাবনা নাড়িয়ে দেয়। নাহার তৃণার গল্পে মার্কিন মুলুকের কথা। জেসিকা এক হতভাগ্য নারী, সুন্দরী। জীবন যাপনের কারণে বহুভোগ্যা। যে সমাজে রয়েছেন তার এক টুকরো রয়েছে এই গল্পে। প্রেম আছে। প্রত্যাখ্যান আছে, হনন আছে। এই গল্পে

বাংলাদেশ তত নেই। লুতফুন নাহার লতার গল্পে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আগ্রাসন, অত্যাচার, হত্যা এবং মুক্ত বাংলাদেশ। কালো মেয়ে হিন্দু মেয়ে টেমির পাকবাহিনীর শিবির থেকে ধর্ষিত আর অত্যাচারিত হয়ে ফিরে এলে পরিবারে তাকে নেয় না। সে নিহত ওমর আলির খোঁজে পথে পথে ঘুরে মরেই যায়, তারপর তৈরি হয় আর এক গল্প। গল্পটি খুব ভালো। একটি কালো মেয়ের কাহিনি। এক প্রেমের গল্প। গল্পটি শেষ অবধি যেন এক লোকবিশ্বাস সৃজনে পরিসমাপ্তি হয়। তাঁর গল্প বয়নের ক্ষমতা আছে। একটি কথা, এই গল্পে পড়েছি বিমল করের পিতৃপুরুষের বাড়ি খুলনা শহরে ছিল। আমি শুনিনি এমন কথা। যা জানি, তা হলো বসিরহাটের লাগোয়া নলকোড়া গ্রামের জমিদার তাঁরা। তিনিও তা বলতেন। কিন্তু লতার গল্পে এমন একটি তথ্য পেলাম। সত্যাসত্য জানার বাসনা রইল। আমেরিকা আদপে এক পুনর্বাসিত মানুষের দেশ। নানা দেশের ভেসে আসা মানুষ আমেরিকায় এসে বাঁচতে চায়। স্বপন বিশ্বাস যে গল্প লিখেছেন, 'আমরা এমনি এসে ভেসে যাই', তা এমন ভাসমান কৈশোর নিয়ে, সকলেই উদ্বাস্তু। পিতামাতার খোঁজ নেই। কেউ এপারে, কেউ সীমান্তের ওপারে মেক্সিকোয়, গুয়াতেমালায়। তিনি তাঁর চারপাশের গল্প লিখেছেন অপূর্ব। সেই কৈশোরের ভিতর বাংলাদেশের কিশোরও আছে। আজকের পৃথিবীতে শিকড় ছেঁড়া মানুষের সংখ্যা অগণিত। স্বপন বিশ্বাস তাদের কথা লিখেছেন মরমি মন নিয়ে। স্মৃতি ভদ্রর গল্প মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের। এই গল্প শেষ অবধি এক ধর্ষিতা কন্যার কথা, যে ছিল পাকশিবিরে। গল্পটি সেই ফেলে আসা বাংলাদেশের কথা। তার ইতিহাস। বয়ন চমৎকার। মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত কুমারী মায়ের কথা রঞ্জনা ব্যানার্জীর গল্পে আছে। পুতুল গল্পটি আমার মনে থাকবে বহুদিন। সদ্য জন্মানো শিশুদের মায়ের কোল থেকে নিয়ে বিদেশে দত্তক হিসেবে পাঠানো ছিল মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার এক ভয়ানক ট্র্যাজেডি। এই ঘটনা কত কুমারী মায়ের জীবন হাহাকারে ভরিয়ে দিয়েছে। শাহীন আখতারের 'তালাস' উপন্যাসেও এই প্রসঙ্গ আছে। স্মৃতির গল্পে তা নেই। কুমারী মায়ের সন্তানসহ তাকে বিবাহ করে একজন। সে-ই তার পিতা। রঞ্জনার গল্পে সেই সন্তানহারা মা ঘুরে ঘুরে পুতুল নিয়ে বেড়ায়। নিজের সন্তানের জন্য কাপড়ের পুতুল বানিয়েছিল সে।

এই সংকলনে গল্পের বৈচিত্র্য আছে। কাজী রহমানের 'টয়লেট পেপার' গল্পটি তার এক নিদর্শন। তিনি কল্পনা বিভ্রমে ভরা এক জীবন নির্মাণ করেছেন। পটভূমি আমেরিকা। লিখনে, বয়নে গল্পটি স্পর্শ করে।

গল্প অনেক পড়লাম, হুয়ান রুলফোর, পেদ্রো পারামোর এক বয়ান লিখেছেন (পেদ্রো পারামোর পৃথিবী) লিখেছেন শাহাব আহমেদ। গল্পটি ভাবনার বৈচিত্র্যে স্তব্ধ করে। মেক্সিকোর লেখক হুয়ান রুলফোর চিরায়ত উপন্যাসের প্রটাগনিস্ট পেদ্রো পারামো ছিল এক অত্যাচারী, সর্বগ্রাসী ভূমধ্যকারী। সেই অত্যাচারী জমিদার পেদ্রো পারামোর যে পৃথিবী সেখানে সকলেই মৃত, মৃতকল্প। শাহাব আহমেদের গল্প আরম্ভ হয় ভাঙনের আগের সোভিয়েত রাশিয়ায়, গল্প শেষ হয় আমেরিকায়। যে ফুলের মতো, নদীর মতো উচ্ছ্বল মেয়েটির সঙ্গে কথকের আলাপ হয়েছিল, প্রেম হয়েছিল রাশিয়ায়, তাকে আবিষ্কার করে সে মার্কিন দেশে। তখন সে ধ্বংস হয়ে গেছে। গল্পটি মনের ভিতরে রয়ে যাবে।

এই সংকলনের গল্পে আমেরিকা এবং বাংলাদেশ রয়েছে। আমেরিকায় ভাগ্যান্বষণে এসে যে সকলে সুখে আছে তা নয়। অনেক গল্পে কান্না নিহিত আছে। প্রবাসের জীবনের জন্য কষ্ট। একটি বিষয় বলতেই হয় ভারতীয় বাংলা ছোটগল্প এবং বাংলাদেশের গল্প একটু আলাদা হয়ে গেছে। বাংলাদেশের গল্প এখনও মুক্তিযুদ্ধকে পার হয়ে আসেনি। আসলে একটা দেশের জন্ম হয়েছিল যে বিপুল ত্যাগের ভিতর দিয়ে, সেই ত্যাগের অভিঘাত এত সহজে যাওয়ার নয়।

অমর মিত্র
২ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

কপাল • অমিতাভ চক্রবর্ত্তী ১৫
ভালোবাসা কারে কয় • আনিসুজ জামান ২৩
আগুনরাঙা কৃষ্ণচূড়া ও একটি কবিতা • আবু সাঈদ রতন ২৭
ভোকাট্টা • আল ইমরান সিদ্দিকী ৩২
দৃষ্টিলাভ • আলী সিদ্দিকী ৩৮
টয়লেট পেপার • কাজী রহমান ৪৫
দুটি হলুদ ইলিশের গল্প • কুলদা রায় ৫০
মায়ের ডায়েরি • জাকিয়া শিমু ৬২
দেহাবশেষ • জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ৭৩
মার সঙ্গে ট্রেনে • দীপেন ভট্টাচার্য ৭৯
নো ওয়ান কিল্ড জেসিকা • নাহার তৃণা ৮৪
একলা দ্বীপের চিঠি • পলি শাহীনা ৯২
চিত্রাঙ্গদা নয় কেউ • পূরবী বসু ১০২
পাশাপাশি রিলকে • ফেরদৌস সাজেদীন ১০৭
বটবৃক্ষের ছায়া • ভায়লা সালিনা ১১৭
ফুটপাতের কয়েকজন বৃদ্ধ • মনিজা রহমান ১২০
জলসন্ধ্যা • মাহবুব লীলেন ১২৭
চুলা, প্লেন ও একটি পরকীয়া • মোস্তফা তানিম ১৩২

পুতুল • রঞ্জনা ব্যানার্জী ১৩৫
নিমক • রাজিয়া নাজমী ১৪৪
আকাশ দেখার অসুখ • রিমি রুম্মান ১৫২
কালো দুর্গা • লুতফুন নাহার লতা ১৬০
পেদ্রো পারামোর পৃথিবী • শাহাব আহমেদ ১৬৬
ঘাতকের সঙ্গে বসবাস • শেলী জামান খান ১৭৩
তিন টুকরো মেঘ ও একফালি কান্না • সজল আশফাক ১৮৫
মুখাবয়ব • সোহানা নাজনীন ১৯৪
আমরা এমনি এসে ভেসে যাই • স্বপন বিশ্বাস ১৯৮
ডায়েরি • স্মৃতি ভদ্র ২০৫

লেখক পরিচিতি ২১৩

কপাল

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের এ গল্প লেখকের নিজের কালের, অন্য পৃথিবীর। আজ এদের সামনাসামনি কেউ দেখতে পাবেন সে সম্ভাবনা নিতান্তই কম। তবু যদি চরিত্রদের কাউকে চেনা-চেনা মনে হয়, চিন্তা করবেন না, এ গল্প একেবারেই আমার মগজের ভিতর হতে উৎসারিত। কোথাও কারও সঙ্গে কোনো ইচ্ছাকৃত মিল নেই। তবে কি জানেন, কপালের কথা কে বলতে পারে! আপনি হয়তো বলবেন আপনার চেনা গল্পটাই আবার চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। যাকগে, শুরু করে দিই।

কাল শেষ দিন। আজকে মেলা তাই পুরোপুরি জমে উঠেছে। নাগরদোলা, বেলুন ফাটানো, পুতুলের দোকান, চুড়ির দোকান, তেলে ভাজা। কী নেই! মেলায় ঢোকার মুখেই জায়গা করে নিয়েছে হাতে হাতে পুরস্কার ধরিয়ে দেয়া হেনা লটারি। মেলার ভিতরে ঢুকে আরও যে কত রকমের দোকান! প্রায় সব দোকানের সামনেই ভিড়। সবার দিকে নজর দিতে গেলে আমাদের গল্প খেই হারিয়ে ফেলবে। আমরা বরং বেছে নিই ঐ নীল জামা পরা বাচ্চা ছেলেটি আর তার পাশের বাচ্চা মেয়েটিকে। ওদের নাম সুমন আর মিলি। মিলিদের বাড়ির পিছনের মাঠে মেলা। তাই বড়দের ছাড়াই ওরা দুজনে মিলে চলে এসেছে। বাড়ি থেকে একটাই শর্ত দেয়া আছে—ফিরতে বেশি রাত যেন না হয়।

মেলার চ্যাঁচামেচি, হট্টগোলের আওয়াজ সামলে সুমন আর মিলির সংলাপ ধরার চেষ্টা করলে যা শুনতে পাচ্ছি তা এরকম।

—তেলে ভাজা খাবি?

—নাঃ, বাবা রেগে যাবে। তুই তো জানিস, বাইরে খাওয়া বাবা একদম দেখতে পারে না।

—মেসো জানতে পারবে না।

—জানবেই। আমায় ঠিক জিজ্ঞেস করবে।

—বলবি, কিছু খাইনি।

—পারব না। বলে দেব আমি।

—হাঁদা একটা!

—তুই তো বলবিই। হতো তোর বাবা আমার বাবার মতো, বুঝতি।

—সে আর কী করবি, যার যা কপাল!

মিলি বেশ গুছিয়ে কথা বলে। মাঝে মাঝে বোঝা যায় না ও কথা বলছে না ওর মা কথা বলছে!

ঘুরতে ঘুরতে ওরা এসে হাজির হয় হেনা লটারির সামনে। মেলায় ঢোকার মুখে একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য দোকানটার সামনে দাঁড়িয়েছিল, ঠিকমতো দেখা হয়নি। এখন সময় নিয়ে ভালো করে দেখবে। এমন দোকান ওদের জীবনে এই প্রথম। দোকানটার নিচের দিকটা সব দিক থেকে ঘেরা। বাঁ দিকের ঘেরাটা কব্জা লাগানো, সেটা খুলে দোকানি ভিতরে ঢুকে একটা একটু উঁচু টুলের ওপর বসে আছে। তার সামনে একটা টেবিলের মতো কিছুর ওপর বাঁ দিকটায় হরেক কাচের বয়ামে কত যে কী রয়েছে! আর, ডান দিকে একটা কাচের বাক্স।

কাচের বাক্স প্রায় অর্ধেক ভর্তি কাগজের টুকরোয়। দুবার করে ভাঁজ করা কাগজ। দোকানির ভাষায় কপালের টিকিট। ভাঁজ করা টিকিটে কী লেখা আছে ভাঁজ না খুলে দেখার উপায় নেই। মাঝে মাঝে কোনো বাচ্চা এসে দোকানির হাতে লটারি খেলার মূল্য ধরে দিচ্ছে। তখন দোকানি ঐ কাচের বাক্সের ওপরের দিকে ঢাকনা আটকানো যে গোল মুখটা আছে, সেটার ঢাকনা খুলে নিচ্ছে। বাচ্চাটা ঐ মুখ দিয়ে বাক্সের ভিতর হাত ঢুকিয়ে ভাঁজ করা টিকিটগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে যেকোনো একটা টিকিট তুলে আনছে।

দোকানি ঐ কাগজের টুকরোর ভাঁজ খুলে দেখিয়ে দিচ্ছে টিকিটের ভিতর কোন সংখ্যা লেখা আছে। দেখানোর শেষে দুটুকরো করে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে সেই কপালের টিকিট। তারপর ঐ বয়ামগুলোর থেকে বা দোকানের পিছনের দেয়ালের গায়ে আটকানো পেরেক কি তাক থেকে কাগজের টুকরোর ভিতর পাওয়া সংখ্যা মিলিয়ে বাচ্চার হাতে তুলে দিচ্ছে, দোকানির ভাষায় 'প্রাইজ'—লজেন্স, বিস্কুট, হজমি-গুলি, কপালের টিপ, দুতিন গাছি করে কাচের আর প্লাস্টিকের চুড়ি, ছোট খেলনা গাড়ি, হুইসেল বাঁশি, কিছু না কিছু। আর তার পরেই একটা আওয়াজ ছাড়ছে—যার যা কপাল, যার যা কপাল, নিয়ে যান আপনার কপালে যা আছে। নিয়ে যান, নিয়ে যান। যার যা কপাল। যার যা কপাল।

সুমন আর মিলি বেশ খানিকক্ষণ ধরে দেখল লটারি খেলা। যা দেখল তাতে মনে হলো, যার কপালে যাই জুটুক, সেগুলোর দাম প্রায় সব সময় লটারি খেলার জন্য দেয়া দামের থেকে বেশি হচ্ছে না। সুমনের চোখ আটকে গিয়েছিল একটা হালকা গোলাপি শার্টে। যাওয়ারই কথা। ঐটাই এই লটারির সবচেয়ে দামি পুরস্কার। কাচের বাক্সটার পাশে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে বেশ কায়দা করে দাঁড় করিয়ে রাখা। তার পাশে দু-তিনটে চুড়ির বাক্সও ছিল, বড় বাক্স, খুব সুন্দর সুন্দর কাচের চুড়িতে ভর্তি।

—শার্টটা দেখেছিস?

—হ্যাঁ।

—ভালো না?

—ভালো, তবে আমার পছন্দ ঐ কাচের চুড়ির বাক্সগুলো।

—আমাদের কপালে নেই।

—জানি, শার্টও না, চুড়িও না। ওগুলোর টিকিট নিশ্চয়ই বেশি রাখে না। আর সব টিকিট গাদা গাদা।

আরও একটু সময় ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির পথে রওনা হলো ওরা। সুমন এই সময় দোকানের পিছনের অন্ধকার জায়গাটা থেকে একগুচ্ছ ছেঁড়া টিকিট মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল। ওর মাথায় একটা মতলব দানা বাঁধছে। আন্দাজ করতে পারা যাচ্ছে কী হতে পারে। কিন্তু ঠিকমতো জানার জন্য আমাদের কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ বরং লটারির দোকানের মালিক কমল আর তার বউ হেনাকে দেখে নেয়া যাক।

হেনা সুন্দরী। হেনার দিকে তাকালে কমলের যে কী ভালো লাগে! কিন্তু তাকানোর অবসর সব সময় কম পড়ে যায়। কমলকে দোকানে রেখে হেনা মাঝে মাঝেই মেলাটা চক্কর মারতে বেরিয়ে যায়। কমল কখনো কখনো আটকানোর চেষ্টা করে। হেনা তখন ভারি মনমাতানো একটা হাসি দিয়ে বলে—তুমি তো জানোই, যাব আর আসব।

কমল কীই বা করতে পারে! হেনার সঙ্গে সক্কলের ভাব। হেনার কারণেই মেলায় ঢোকার ঠিক মুখটায় লটারির দোকানটাকে বসানো গেছে। হারুর আইসক্রিমের দোকানটা পড়েছে মেলার ভিতরে একটা কোণায়। এখান থেকে দেখাও যায়। কিন্তু এই স্পটের সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। আজ সকালেও গজগজ করছিল। হেনা মিষ্টি করে ঝামটে উঠল,

—তুমার ইস্পট কি কেউ তুমারে গলায় বেঁধে দিয়েছিল?

স্পটটা আসলে আপসে পালটাপালটি করা হয়েছিল। হারু, কমল দুজনেরই কিছু বলতে গিয়ে বলা হয় না। হেনা শাড়ির আঁচলটা কোমর থেকে আলগা করে এক চমৎকার বিভঙ্গে আবার কোমরে পেঁচিয়ে নিচ্ছে। বেরিয়ে গেল কোথায়! ফুরিয়ে যাওয়া বিড়িটা ধুলোয় ঘষে নিভিয়ে দিয়ে উঠে যাওয়ার আগে হারু চোখ টিপে কমলকে বলে গেল,

—কপাল করে বউ জুটিয়েছ বটে কমলদা!

আজ মেলার শেষ দিন। দুপুরে বাড়িতে পড়ার ঘরে বসে ছেঁড়া টিকিটগুলো ভালো করে পরীক্ষা করল সুমন। সাধারণ কাগজ। এক্কেবারে ওর অঙ্ক খাতাটার পাতাগুলোর মতো। কোনো ঝামেলা নেই। ভিতরে একটাই মাত্র সংখ্যা লেখা। নকল করাটা কোনো সমস্যাই না। অঙ্কের খাতাটা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল

সুমন। বারো যন্ত্রপাতির বাক্স খুলে ভালো ছুরিটা নিয়ে এলো। চমৎকার টিকিট তৈরি হয়ে গেল।

কয়েকটাই বানিয়ে ফেলল। অর্ধেক টিকিটের ভিতর লিখল ২৫, বাকিগুলোর ভিতর ২০। কাল দেখে এসেছিল, শার্টের প্যাকেটের গায়ে লেখা ছিল ২৫ আর চুড়ির বাক্সগুলোর গায়ে ২০। টিকিটগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর ভাঁজ করে ফেলল সেগুলোকে। ২৫-এর গুলোকে নিল প্যান্টের ডান পকেটে, ২০-এর গুলোকে বাঁ পকেটে। জামার পকেটে নিয়ে নিল কয়েকটা ছেঁড়া টিকিট।

মিলি এসে গিয়েছিল। মিলি সুমনের থেকে বছর দুয়েকের ছোট। হলে হবে কী, চালু মেয়ে সে। ও মেয়ে সঙ্গে থাকলে সুমনের বিপদ-আপদের আশঙ্কা কম। সুমনের বাড়িতে অন্তত সেরকমই ভাবে সবাই। মিলিকে নিয়ে সুমন মেলার দিকে হাঁটা লাগিয়ে দিল।

মেলায় যাওয়ার পথে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ল সুমন। মিলিকে দেখাল তার বিরাট কীর্তি।

—তুই কী হয়েছিস সুমনদা! ধরা পড়ে গেলে!

—পড়ব না। এই দেখ আসল টিকিটগুলো।

মিলিকে ছেঁড়া টিকিটগুলো দেখাল সুমন। মিলি একমত হলো যে সুমনের বানানো টিকিট দেখতে একেবারে আসল টিকিটের মতো। কিন্তু একটা তিরতিরে ভয় তবু লেগেই রইল।

অনেক পরামর্শের পর ঠিক হলো দুজনে আলাদা আলাদা যাবে। মিলি নেবে শার্টের টিকিট, আর সুমন চুড়ির। তাহলে কেউ সন্দেহ করবে না। সুমন প্রথমে লটারি খেলবে। পরে মিলি যাবে। তাকিয়ে দেখল সুমন—মিলির চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। সুমনের নিজের ভিতরেও চিন্তা, উদ্বেগ, উত্তেজনা সব মিলেমিশে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাইরে অত্যন্ত স্বাভাবিক থাকার চেষ্টাটা ভালোভাবেই করে উঠতে পারল সে। এগিয়ে গেল দোকানের দিকে। দুপুর দুপুর ফাঁকায় ফাঁকায় মিটিয়ে ফেলাই ভালো।

বাঁ হাতে টিকিটের দাম দিল। একটু মুঠো করে রাখা ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিল কাচের বাক্সের ভিতর। মুঠোর ভিতর নিজের বানানো টিকিট। মুঠোটা বাক্সের মধ্যে কয়েকবার নেড়ে চেড়ে বার করে আনল সে। টিকিটটা তুলে দিল দোকানির হাতে।

দোকানি টিকিটটা খুলেই স্থির হয়ে গেল। সুমনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর টিকিটটা খানিকটা ছিঁড়ে ক্যাশ বাক্সের ভিতর রেখে দিয়ে কেমন একটা গলায় বলল,

—আবার তোল।

—কেন? টিকিটে কত নম্বর ছিল?

—চোপ। এক থাপ্পড় মারব। আবার তুললে তোল, নইলে ভাগ।

সুমনের চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কাচের বাক্স থেকে হাতটা বের করার সময়ই নজরে পড়েছিল খানিকটা দূরে বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে খাকি পোশাকের কেউ। এদিকে নকল টিকিটটা দোকানি ক্যাশবাক্সের ভিতর রেখে দিয়েছে। আতঙ্কের চোটে চোখের জল উপচিয়ে যায় প্রায়। কোনো রকমে টিকিটের বাক্সের গোল মুখটার ভিতর আবার হাত ঢুকিয়ে একটা আসল টিকিট বার করে আনল সে। ঐ টিকিট মিলিয়ে পাওয়া গেল ছোট ছোট কয়েকটা বিস্কুটের একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের প্যাকেট। সেটা হাতে নিয়ে স্বাভাবিক থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে মেলার ভিতর ঢুকে গেল ও।

দূর থেকে সমস্তটা নজর করছিল মিলি। সেও একটু পরেই ঢুকে এলো মেলার ভিতর। লটারির দোকানটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল দোকানি তার বউকে একটা ছেঁড়া টিকিট দেখিয়ে চাপা গলায় কী সব বলছে। সে গরগর করছে আর বউটা খি খি করে হাসছে। কোনো রকমে পা চালিয়ে মেলার ভিতর ঢুকে গিয়ে সুমনকে খুঁজে নিল সে। বেচারি বড়ই উদাস হয়ে গেছে।

লটারির টিকিট না কেনায় মিলির পয়সাটা বেঁচে গিয়েছে। সুমনের মন ভালো করার জন্য সেই পয়সায় একটা আইসক্রিম কিনে ফেলল চটপট। কাঠির গায়ে জমানো মিষ্টি বরফ, হালকা সুন্দর গন্ধ। কখনো কখনো আইসক্রিমের কাঠিটা রুটি বেলার বেলনের মতো আইসক্রিমের দুপাশ থেকেই বেরিয়ে থাকে, আজকে ঐ রকম একটা পেয়ে গেল মিলি। কী মজা! আইসক্রিমটা হাতে নিয়ে সুমনের দিকে বাড়িয়ে ধরল। দুজনে কাঠির দুদিকে ধরে মাঝে মাঝে গালে গাল ঠেকিয়ে দুদিক থেকে একসঙ্গে আইসক্রিম খেতে থাকল।

এই দুপুরবেলায় মেলাটা একটু ঘুম দিয়ে নিচ্ছে। আইসক্রিমের দোকানের এখানটা থেকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে লটারির দোকানটাকে দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে একটা লম্বা শ্বাস ছাড়ল সুমন। মিলি বিজ্ঞের মতো তাকে সান্ত্বনা দিল।

—দুঃখ করিস না সুমনদা। আমাদের কপালে ছিল না, কী করবি বল।

গল্পটা এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আজকে আর একটু এগোতে ইচ্ছে করছে।

সুমন যখন কমলের ধমক খেল, মিলি একাই যে শুধু সেটা নজর করেছে, ব্যাপারটা তেমন নয়। একটু দূরে খৈনী ডলতে থাকা লাঠিধারী হরিশ প্রসাদেরও সেটা নজরে পড়েছিল। মফস্বল শহরের এই মেলায় রাতের বেলায় দুজন লাঠিধারী পাহারায় থাকলেও দিনের বেলায় মেলাটা একজনের হাতেই থাকে। এরা কোনো থানার লোক না। তা বলে দাপট কিছু কম নয়। খাস মেলা কর্তৃপক্ষের বসানো গার্ড। তবে বেতন সামান্যই। সেটা নানাভাবে পুষিয়ে নিতে লাগে, কী আর করা যাবে!

বাচ্চা ছেলেটা দোকান ছেড়ে মেলার ভিতরে ঢুকে যেতেই হরিশ খৈনীটাকে মুখের ভিতর চালান করে দিয়ে ধীরে সুস্থে লটারির দোকানের দিকে পা বাড়াল। ওকে আসতে দেখেই হেনা দোকানের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হরিশ এসে হেনার পাশে বিপজ্জনক নৈকট্যে সেঁটে গিয়ে জিজ্ঞেস করল,

—চিটিং কিয়া তুনে?

হরিশ বাংলা বলে যে কারও মতনই। কিন্তু এই সব সময়ে বাংলা ছেড়ে অন্য কিছু বললেই কেসটা আরও টাইট হয় বলে হরিশের বিশ্বাস।

—কী যে বলেন গার্ডদাদা, আমার এখানে কোনো রকম চিটিংয়ের কাজ-কারবার নেই। আমার সব কাজ এক নম্বরী।

—নিকাল।

—কী? কী বার করব?

—হরিশ প্রসাদ তার হাতের ডান্ডাটি ক্যাশবাক্সের ওপর ঠুকে বলল,

—উও টিকট নিকাল।

কমল ভয়ে ভয়ে টিকিটটা বার করে দিল। হরিশ প্রসাদ পড়ল,

—বিশ নম্বর! কৌন চিজ বে?

হেনা হরিশের গায়ের ওপর ভর দিয়ে হাত বাড়িয়ে চুড়ির বাক্সগুলোর থেকে একটা তুলে নিয়ে হরিশ প্রসাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,

—এইটা আপনিই নিন, দাদা।

—কেয়া?

হেনা এর মধ্যে একটু সরে গিয়েছিল। বেশি না, একটু। মধুর হেসে বলল,

—বাড়ি, বাড়ির জন্য, বউদিকে দেবেন।

হরিশ একবার হাতের চুড়ির দিকে তাকাল, একবার দোকানির বউটার দিকে। শালি দাদা ডাকে! এ চোরচোট্টা লোকের এই রকম বউ জোটে কী করে? কপাল বটে!

চুড়ির বাক্স হাতে ধরে রেখেই জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যায় হরিশ প্রসাদ। হেনা আবার সরে এসেছে। হরিশের কথার মাঝে মাঝে এপাশ ওপাশ করে। চেপে আসে, হরিশ সরে না।

কমল বলতে থাকে যে বাচ্চা ছেলেটা বদমাশের একশেষ। নকল টিকিট নিয়ে এসেছিল। কিন্তু কীভাবে সে বুঝল যে সেটা নকল, তার সঠিক কোনো উত্তর সে দিতে পারে না। হরিশের সন্দেহ হয় দামি জিনিসগুলো আসলে খদ্দের ধরবার জন্য, কিন্তু টিকিট নেই তাদের। এই নিয়ে কতটা চাপ দেয়া যায় সেটা ঠিক করতে করতে, আর অন্য একটা চাপের আমেজ নিতে নিতে, একসময় সে এখনকার মতো দান ছেড়ে দেয়।